উইক্ষল টুইক্ষল
অনিল আচার্য

এ এতদিন পরে কেন ছাপলাম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। হঠাৎ কেন এই নাটকটিই ছাপা হলো, অন্য নাটক নয় কেন? অনেকে অভ্যাসমতো ইঁদুরের গন্ধ পাবেন হয়তো। আসলে বিষয় এবং চিন্তা একটু আলাদা। খোলশা করে বলা দরকার।

আমাদের বহুদিন ধরে মনে হয়েছে সবটা মিলিয়ে একটা 'স্যোস্যাল ক্রিটিক' কি নির্মাণ করা যায় না? পত্র-পত্রিকা এবং নাটক কি আজ এতটাই বিচ্ছিন্ন যে 'কমন প্রোগ্র্যাম্যাটিক ইউনিটি' কি এতই অসম্ভব? যদি তেমন নাটক অভিনীত হয়, যে আমাদের সমাজ-চেতনায় আঘাত করবে, তেমন নাটক আমরাই নির্বাচন করে নেব। নাটকের দল নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। যেমন এ-ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি।

আশা করি, পাঠক এর মধ্যে, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যেমন আছে, 'তুমি কোন দল'? এই ভাবনায় ভাবিত হবেন না। অনুষ্টুপ কোনও দলীয় পত্রিকা নয়। কেউ কেউ বলতে পারেন তবে কি অনুষ্টুপ যাত্রাদলের বিবেক? সেটা কি ভয়ঙ্কর প্রিটেনশন নয়?

বলতে পারছি না। অনুষ্টুপ কী ও কেন? কী করতে চায় অনুষ্টুপ?

আমার মনে হয় গঙ্গার বুকে পানাপুকুরের শ্যাওলা যেমন ভেসে যায় তেমন আমরা ভেসে চলেছি, ডি. এল. রায়ের গানের মত।

তবে অনেকে ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁদের অক্ষমতায় এবং দম্ভে কীভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে উগ্র মৌলবাদী শক্তি। আমরা সুস্থ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা চাই, যাতে দেরি না হয়ে যায়। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না, এ-কথাটা বিনয়ের সঙ্গে বার বার মনে করিয়ে যাবো।

রাজা যাই ভাবুন না কেন।

ব্রাত্য বসু
নাট্যকারের বয়ান

উইক্ষল-টুইক্ষল-এর পরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ প্রায় বারো বছর আগে। এক শীতের সকালে সে ভোরের ট্রেনে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তখন তার মুখভর্তি দাড়ি ছিল, চোখে রাগ ছিল, মনে অন্যরকম থিয়েটার করার ইচ্ছে ছিল এবং পকেটে পয়সা ছিল না। ফলে অচিরেই আমাদের বন্ধুত্ব হল—কমবয়েসের জেদের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম এসবই মিলেমিশে সাংঘাতিক সব থিয়েটারের প্ররোচনা সে দিতে শুরু করল, বাতাস সেইসব দিনগুলির কিছু কিছু হয়ত মনে রেখেছে। একদিন দেবেশ উল্টোডাঙা থেকে ফোন করে জানাল দুপুরে খাবার পয়সা নেই। আমি আমার টিউশনির টাকা নিয়ে গেলাম। দুজনে মিলে পেটভরে খেলাম। ওকে জানালাম মোট এ্যাতো টাকা বিল হয়েছে, পরে শোধ দিস। তখন আমরা চারমিনার স্পেশাল খেতাম। দেবেশ সিগারেটে টান দিয়ে দাবি জানালো এবার সে ট্যাকসি চড়বে। মনে আছে সে সময়ে আমরা শেয়ারে ট্যাকসি চড়তাম, খাবার খেতাম, নেশাও করতাম।
হয়তো সেসময়েই বা তার কিছু আগে পরে আমি ওকে উস্কানি দিয়েছিলাম থিয়েটার করতে গেলে একসঙ্গেই করতে হবে। আমার ওই ভাঙচিতে দেবেশ রাজি হয় এবং কলকাতায় চলে আসে, তখনই ওর 'উইক্ষল টুইক্ষল' এর বীথি, কস্তুরী বা লালীর সঙ্গে আলাপ। দেবেশ সাহস অর্জন করে ও লালীকে ওই যাকে বলে 'প্রপোজ' সেটা করে ওঠার ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। যাই হোক তারপরেই দেবেশ লালীকে বিয়ে করে, কলকাতায় থাকতে শুরু করে এবং সাময়িকভাবে থিয়েটার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বন্ধুত্বের নিজস্ব শর্ত এবং গণতন্ত্র অনুযায়ী আমাদের সম্পর্কও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আমাদের আকাদেমিতে বা রাস্তায় বা অন্য কোথাও দেখা হত—তখন আমাদের কারুরই দাড়ি-গোঁফ আর ছিল না, চোখে ভয় ঢুকেছিল, মনে হয়তো বা তখনও অন্যরকম থিয়েটার করার ইচ্ছে ছিল এবং পকেটে পয়সাও ছিল। দেবেশ নতুন দল করেছে, পুরনো বন্ধু হিসেবে আমিও তার প্রযোজনা দেখতে যেতুম, মতামত দিতুম, কফি খেতুম তারপর আবার মতামত দিতুম—এইরকমই ছিল বিষয়টা, মাঝে মাঝে কথাও হত দুজনে ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে গেলে কেমন হয়-পেলিং কিংবা গোয়া কিংবা নিদেনপক্ষে দীঘা বা পুরী! অফসিজনে নাকি ভালো ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়।
এইরকম অবস্থায় হয়তো আমরা দুজনেই দুজনের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং খানিকটা অনুকম্পা দেখিয়ে ঠিক করলাম নতুন নাটক করব। দেবেশ ওর দলের অর্থাৎ 'সংসৃতি'র পক্ষ থেকে এ নাটক করবে। আমি নাটকটা লিখব। আমি খালি একটাই শর্ত দিয়েছিলাম—যদি করতেই হয় তাহলে যাকে যে চরিত্রে লাগবে ঠিক তাকেই নিতে হবে। দেবেশ রাজি হয়েছিল। আমিও 'উইক্ষল-টুইক্ষল' লিখে ওকে দিয়েছিলাম। নাটকটার খসড়া গত দুবছর ধরেই আমার মাথায় ঘুরছিল; দেবেশের জন্যই সেটা শব্দ আর অক্ষরের রূপ ধরতে পারল। এছাড়া নাটকটি নিয়ে আমার আর বিশেষ কিছুই বলার নেই—দু একটি জায়গা নিয়ে আমার একটু খুঁতখুঁতানি আছে, নতুন করে লিখলে ভালো হত। কিন্তু এই নাটকটির প্রযোজনা নিয়ে দু-একটি কথা আমি আরো বলতে চাই, কেননা আমিও আবার সেইসব নিন্দুক সমালোচকদের সঙ্গে একমত, নাটকটা তেমন কিছু না, কিন্তু প্রযোজনাটি অসাধারণ।
সত্যিই তাই। তার মূল কারণ অবশ্যই অভিনয়। কার কথা বলব? বা বলা ভালো, কার কথাই বা বলবো না? ধরা যাক—দেবশঙ্কর হালদার। বাংলা মঞ্চে সর্বকালের সেরা অভিনেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যতো অন্তর্ঘাতী নৈঃশব্দ ছিল, সংযম ছিল এবং আশ্চর্য পরিমিতিবোধ ছিল, তা যেন শরীরী রূপ ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়েছে সব্যসাচী চরিত্রে। রজতাভ দত্তের এত মাপা প্যাশনেট অভিনয়, আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দেবশঙ্কর আর রজতাভ যখন মুখোমুখি অভিনয় করেন, মনে হয় এই-এটাই তো শিল্প। শ্যামল চক্রবর্তী! মঞ্চে বামন থেকে দানব হয়ে যান অনায়াস সাবলীলতায়। ওই স্বল্প পরিসরে তাঁর ঘাম রক্ত, মৃত্যু স্পষ্ট যেন ছোঁয়া যায়। মায়া ঘোষ আশিস দাস, কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দাশ, অসিত বসু, এঁদের সম্পর্কে যা বিশেষণই ব্যবহার করি, খেলো আর পুরনো লাগবে। রণজিৎ চক্রবর্তী-প্রদীপ ভট্টাচার্য বা অন্যান্যরা পুরো বিষয়টাকেই এক অদ্ভুত উচ্চতা দিয়েছেন। তার সঙ্গে আলো, মঞ্চ, সংগীত এ সবই ঠিকঠাক মিলমিশ পেয়েছে। পরিচালক হিসেবে দেবেশ এগুলিকে এমন ছাঁদে বেঁধেছে যাতে সত্যিই কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।
এছাড়া আমি ধন্যবাদ জানাই 'সংসৃতি' গোষ্ঠীকে যাঁরা আমার এ নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন এবং শ্রী অনিল আচার্য ও অনুষ্টুপ পত্রিকাকে, যাঁদের আগ্রহে নাটকটি মুদ্রিত হতে পারল। এছাড়া আমি আরেক জনের কথা বলতে চাই। তিনি হলেন আমার বন্ধু ও অগ্রজ শ্রী প্রীতিময় চক্রবর্তী। তাঁর আত্যন্তিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে নাটক রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে, যোগাচ্ছে। ধন্যবাদ জানাই সেইসব অগণিত দর্শকদের যাঁরা এই প্রযোজনাটিকে জনপ্রিয় করেছেন। আর প্রণাম জানাই শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে যিনি তাঁর

অকৃপণ স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে এই প্রযোজনাটিকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আর পরিশেষে ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাই বাংলা থিয়েটারের সবাইকে, যাঁদের সহযোগিতা ও ভালোবাসা না পেলে 'উইক্ষল টুইক্ষল'-এর এতোগুলো অভিনয় হতে পারতো না!

দেবেশ চট্টোপাধ্যায়
অন্ধের স্মৃতিকথন

'উইক্ষল টুইক্ষল' সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। কারণ এই নাটকটার সঙ্গে আমি এতটাই সম্পৃক্ত যে বলার বা লেখার মতো নিরাপদ দূরত্ব এখনও তৈরি হয় নি। প্রযোজনা তৈরী হওয়ার সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত অনুভবের স্মৃতিচারণই এই লেখার উপজীব্য। নাটকটা ব্রাত্য লেখা শুরু করে ২০০১-এর আগস্ট-এ, শেষ হয় ডিসেম্বর ২০০১-এ। ব্রাত্যর সঙ্গে আমার পরিচয় বছর দশেক বা তারও বেশী, আমি যখন গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের সঙ্গে যুক্ত তখন থেকেই। গোবরডাঙ্গা থেকে ১৯৯৩-এ যখন কোলকাতায় চলে আসি তখন প্রথমে ব্রাত্যর সঙ্গে গণকৃষ্টিতেই কাজ করেছি। ফলে ব্রাত্যর সঙ্গে আমার থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবনার উভমুখী বিক্রিয়া কাজ করেছে সবসময়ই। পরিচালক হিসাবে আমি যখন 'অগ্নিবর্ষী' বা 'প্রতিনিধি'তে কাজ করেছি, ব্রাত্য আগ্রহ নিয়ে দেখেছে। ফলে শুধু বন্ধুকৃত্য নয়, ওর মনে হয়েছিল এই নাটকটা ও ভুল জায়গায় দিচ্ছে না। আর যেহেতু দলগত ধাঁচায় আমি নাটকটা ভাবতে চাইনি সেহেতু ওর বাকি সংশয়টুকুও কেটে গিয়েছিল। নাটক পড়া শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর ২০০১-এ। প্রথম দু-একটা পড়ার পর থেকে ও আর কোন দিন রিহার্সালে আসতে চায়নি। ১৭ জুলাই গণকৃষ্টি নাট্যোৎসবে প্রথম শোয়ে ও উইংস-এর পাশ থেকে অল্প কিছুক্ষণ দেখে; আর পুরো নাটকটা বসে দেখে নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলায়, ১৮ ডিসেম্বর ২০০২-এ। ভাবা যায়? এটা অবশ্য ব্রাত্য বলেই সম্ভব।
বাংলা থিয়েটারের সেরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই নাটকে কাজ করছেন। না বিচ্ছিন্নভাবে নয় আমরা কাজ করছি একটা 'টোট্যাল টিম' হিসাবে। নির্দেশক হিসেবে আমার কঠিন কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে সবার সঙ্গে আমার খুব সুন্দর মানসিক বোঝাপড়ার জন্য। এবং এটা সম্ভব হয়েছে প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতায়। দেবশংকর, রজতাভ, মায়াদি, অসিতদা, রণজিৎদা, শ্যামলদা, প্রদীপদা, আশিসদা, ববিদা, তাদের ভাবনা, সিরিয়াসনেস এবং ভালোবাসা দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন সবসময়। মিন্টু, অমিত, সঞ্জয়, অভিনব, ইন্তু, পিণাকী, মৈত্রেয়ী, কৌশিকী এবং কস্তুরী ছাড়া এই প্রযোজনা ভাবাই যেত না। আমি কৃতজ্ঞ সবার কাছে। মঞ্চে সঞ্চয়ন আর আলোয় সুদীপ আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন সেই নাটক পড়ার দিনটি থেকেই। দর্শক মাত্রেই জানেন এই নাটকে আলো ও মঞ্চের অসাধারণ মেলবন্ধনের কথা। তপনদা বিনিদ্র দুই রাত্রি কাটিয়েছেন এই আবহ সৃষ্টিতে। আসলে এই নাটকে স্ক্রিপ্ট, অভিনয়, মঞ্চ, আলো, আবহের একটা সঠিক মিশেল হয়, সেটাই বোধহয় দর্শককে চার্জ করে।
প্রথম শো-র পর থেকেই এ নাটক নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, বহু মানুষ এই নাটক দেখেছেন এবং দেখছেন। প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, হয়েছে কুৎসাও। কিন্তু জিতেছে শেষ পর্যন্ত থিয়েটার, প্রকৃত অর্থেই যাকে বলে রাজনৈতিক থিয়েটার, যে প্রশ্নের ঘুষিটা ব্যবস্থার তলপেটেই মারতে ভালোবাসে, যে মেকি-শিল্পের ছেনালিপনায় মুখ না ঢেকে রাজা আর তার চাকর-বাকরদের 'ল্যাংটো'-ই বলে। আর যে নাটক হাতে সব সময়ের জন্যই জেলে রাখে ভণ্ড সময়কে জ্বালিয়ে দেবার আগুন। এ নাটক সত্যি সত্যিই তেমনই এক নাটক।
'উইক্ষল-টুইক্ষল' প্রযোজনার পর সংসৃতি আর আমার দায়িত্ব আরও বাড়ল, আমি জানি।

বিভাস চক্রবর্তী
মুগ্ধ ও বিস্মিত করা প্রযোজনাটি

প্রায় মাসছয়েক হয়ে গেল আমি উইক্ষল-টুইক্ষল দেখেছি। কিন্তু যেহেতু এটি মনে দাগ কাটার মতো প্রযোজনা তাই সেই দেখার ভিত্তিতে কিছু কথা বলা যেতেই পারে। নাটকটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা প্রোডাকসশনের মধ্যে যেগুলো দেখতে চাই, যেমন মঞ্চটাকে কেমন করে ব্যবহার করছেন পরিচালক, চরিত্রগুলোর চলাফেরা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কিভাবে একেকটা মুহূর্ত তৈরী হচ্ছে, আপাত সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কহীন দৃশ্যগুলো কিভাবে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে—এইসব। মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর বিস্মিত হয়েছিলাম একইসঙ্গে যে দেবেশের কোন কাজ এর আগে আমি দেখিনি। দেবেশের সঙ্গে আমার পরিচয় অন্যসূত্রে। সে দীর্ঘদিন ধরে থিয়েটারের গবেষণামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এটা একটা বড়ো কাজ যেটা সচরাচর চোখে পড়ে না, লাইমলাইটে আসা যায় না বা প্রকাশ্যে বাহবা পাওয়া যায় না। দেবেশের এই পরিচয়টাই আমার মনে ছিল। নাটকের একদম শুরুতে একটা পার্কের দৃশ্য। সঞ্চয়ন এখানে মঞ্চসজ্জায় বাস্তবতার ভাঙচুর করে একটা বাস্তবতার আদল তৈরি করেছে। এই পার্কে যখন সব্যসাচী হঠাৎ উঠে আসেন তখন সেটা দারুন নাটকীয় ভাবে সাজানো হয়েছে এবং অদ্ভুত একটা ধাক্কা দেয়। এই যে সব্যসাচী ২৬ বছর ধরে ঘুমোচ্ছিল, এটা আমাদের ধরে নিতে বেঞ্চের পেছন থেকে উঠে আসার দৃশ্যটা খুব সাহায্য করে। এটাই থিয়েটারের কৌশলের দিক, খুব সদর্থক অর্থে চমকের দিক। একটা ভালো থিয়েটারের খুব ভালো শুরু এই দৃশ্যটা। তারপর নাটকটা যখন সংলাপের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগোয় তখন বাবা, ছেলে, মেয়ে, মা সবার হাঁটাচলা অভিনয়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপা টেনশন বুনে দেওয়া হয়। তবে বাবা-ছেলের মধ্যে যে মূল্যবোধের ব্যবধান, যে দ্বন্দ্ব, এটাই নাটকের সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট। এই দ্বন্দ্ব আমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করে, হৃদয়ের কাছাকাছি আসে, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। সব্যসাচীর অভিজ্ঞতা যত পরতে-পরতে খোলে, দর্শকদেরও নাটক সম্পর্কে একটা এক্সপেক্টেশন তৈরী হয়, মনে মনে প্রেডিক্ট করতে থাকে। অনেক সময় আনপ্রেডিকটেবল্ কিছু ঘটে, তার সঙ্গে মূল নাটকের কোন সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক না হারিয়ে, প্রেডিক্টেবল হয়েও পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো বিস্ময় এই নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে। এই নাটকে মঞ্চ ব্যবহার করার পদ্ধতি খুব ব্যালান্সড। জোর করে কম্পোজিশন তৈরী নয়, খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণভাবে এই নাটকে পুরো মঞ্চটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনের ঘর ভেঙে যেভাবে সব্যসাচী পাগলের মুখোমুখি হয়, আবহে ভৈরবী বাজে তখন এই দৃশ্যটার ডিজাইনের জন্য মঞ্চে অন্য একটা পরিবেশ তৈরী হয়। আবার বন্ধু রাজনের কুঁকড়ে থাকা ঘরের স্পেসটাকে ছোট করে আনার আইডিয়াটা বেশ ভালো। এখানে দেবেশ খুব কম সরঞ্জামে ডিটেলিং করেছে। শেষ দৃশ্যে যে ছবিটা তৈরী হয় অনবদ্য, ভোলা যায় না।
অভিনয়ে দেবশংকর হালদার, রজতাভ দত্ত, মায়া ঘোষ, অসিত বসু, কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, রণজিৎ চক্রবর্তী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আশিস দাস প্রত্যেকেই খুব ভালো। আর একটা কথ, যদি এই নাটক দেখে চোখে জল আসে তাহলে সেটা রাজনৈতিক কারণে আসেনি। এসেছে নাটকের মানবিক কারণেই, বিশেষকরে বাবা-ছেলের দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের যন্ত্রণায়। আবার আজকের দিনে এই নাটকের রাজনৈতিক প্রয়োজনও রয়েছে। কারণ এই সময় এই ভাষায় কথা বললেই উদ্দিষ্টদের কাছে পৌঁছনো যায়। 'উইক্ষল টুইক্ষল, কোনও গভীরতা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে বা তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়েও তাই আঘাত করেছে তার লক্ষ্যকে। সমর্থন পেয়েছে মানুষের। হয়ে উঠেছে আজকের দিনের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক থিয়েটার।

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়
এতো হিম্মৎ, এতোখানি সাহস
বাংলা নাটক হালফিল খুব বেশী দেখে নি

অসমসাহসী ব্রাত্য বসু-র 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নিয়ে বলবার কথা একটাই, সাতাশ বছর একটি রাজ্যে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা একটি দলের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি, কোনো আড়াল না রেখে কথা বলবার দুঃসাহস সেই দেখিয়েছে। বিভাস চক্রবর্তী-র 'অদ্ভুত আঁধার' কোনো অজ্ঞাত কারণে (হয়তো সত্তর-এর জরুরী অবস্থা আধুনিকায়ন/ বামপন্থীয়ানা) আর অভিনীত হয় না মঞ্চে, ব্রাত্য-র লেখা এই নাটক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনায় এখনো তার পথচলা থামায় নি।

আমরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' আবার আমাদের প্রতিবাদী হতে শেখায়। রিপভ্যান উইঙ্কলের রূপকথার গল্প আমরা পড়েছি। দীর্ঘ নিদ্রার পর ঘুম থেকে জেগে তার মনে হয়েছিল পৃথিবীটা একইরকম আছে। আসলে সময়ের ব্যবধানে সে তখন আমূল বদলে গেছে। এই রূপকথাটাই ফিরে আসে নাটকে। তবে সমসময়ের আরো দুটো নাটক 'মেফিস্টো' কিম্বা 'প্রাচ্য'-র মতো রূপকসর্বস্বই হয়ে ওঠে না, এটা লক্ষ করবার বিষয়। সেটা আসে শুধু ক্ষীণ সূত্রের প্রয়োজনই। নিভে গিয়েও জ্বলে ওঠা নক্ষত্রের কথকথা।

ক্ষমতাসীন বামপন্থী প্রশাসনের বিচ্যুতি, আদর্শহীনতার পাশাপাশি এই নাটকের সব্যসাচী সেন তার গড়ন ও বিকাশপর্বের কথা বলেন। বলেন, আত্মত্যাগ আর কমিটমেন্টের অঙ্গীকারের কথা। সেই উচ্চারণ আমাদের আবার নতুন করে ভাবায়। আগাগোড়া এ নাটক রাজনৈতিক। প্রতিবাদ পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংসদপন্থী কমিউনিস্টদের সহবাসের বিরুদ্ধেও।

'অরণ্যদেব' নাটকে যদি থাকে বোর্হেস, কিম্বা, টমাস মান সুলভ 'ফ্লাস ফরোয়ার্ড রীতি, তাহলে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' বারেবারেই ফিরে যেতে চায় 'ফ্লাশ ব্যাকে'। যেখানে 'তৃণমূল' শব্দটি শুনে আদর্শবাদী সব্যসাচী বেজায় অবাক হন না—কারণ প্রমোদ দাশগুপ্ত ঐ তৃণমূল স্তর থেকেই বিপ্লব আরম্ভ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেটা যে এখন একটা দল, এটা তিনি বোঝেন না। মেট্রো থেকে মাইক্রোচিপস্ থেকে মমতা ব্যানার্জী—সবই তাঁর কাছে বড়ো অচেনা লাগে। সময়টা বদলে গেছে। পার্টি মানে এখন প্রোগাম—আখের গোছানো ধান্দাবাজি—সব্যসাচী বোঝেন না—ধন্দে পড়ে যান। ইন্দ্র বলে, এখন আছে শুধু ইনফর্মেশন হ্যাভস্ আর ইনফর্মেশন হ্যাভ-নটস্‌দের শ্রেণী—সে কি তারই আত্মজ? এই নাটককে মোক্ষমভাবে কামড়ে ধরেছে মরীয়া সমকাল। 'সংসৃতি-র এই নাটকের মুখ্য চরিত্র সব্যসাচী সেন সদাচারী নিষ্ঠাবান সি পি (এম) কর্মী। মেয়ে 'ঋত্বিকে'র ছবি দেখতে যাবে শুনে তিনি লাফিয়ে ওঠেন এই ভেবে যে ঋত্বিক ঘটক আবার ছবি করছেন? মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা? ভোলা কি যায় সে সব। আসলে ১৯৭৬ সালে পুলিশের তাড়া খেয়ে তিনি কাস্টডি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

২৬ বছর টানা ঘুমিয়ে ২০০২-তে হঠাৎ জেগে উঠে সে অপরিচয়ে বিস্মিত, বিপন্নতায় কান্নাসিক্ত, যন্ত্রণায় রক্তাক্ত, থেকে থেকেই তার বমি পায়। এই সিরিয়াস বিষয়টিকে ব্রাত্য তার চেনা মোটিফে শুরুওয়াত ঘটিয়েছেন প্রবল মজার মধ্য দিয়ে। শচীন তেন্ডুলকরের সেঞ্চুরির খবর পড়ছিলেন পার্কে বসে এক ভদ্রলোক। 'শচীন' নামটা শুনেই তার 'শচীনকর্তা-র কথা মনে পড়ে যায়।

মিশেল ফুকো-র 'ম্যাডনেস এ্যান্ড সিভিলাইজেশন' বইটির কথা চকিতে মনে পড়বে। সেই মানুষটিকে, মঞ্চে যবনিকা নেমে আসার ঠিক আগেও যে হাঁটুর উপর পা তুলে ভাবে, সে যেন এক আয়নারই মতো। সেখানে, ঐ বিশ্বস্ত দর্পণেই আমরাও দেখি নিজেদের মুখ।

'উইঙ্কল টুইঙ্কল' এভাবেই আমাদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। 'হঠাৎ-ই যেন দু'ঘন্টা সময়ের বিন্দুতে প্রায় তিন দশককে পরিব্যাপ্ত সময়সিন্ধু ঝলসে উঠল' রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের এই অভিমতের সঙ্গে আমরাও নিরুপায়ভাবে একমত না হয়ে পারি না।

অনবরত বিদেশি বিনিয়োগ, 'আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে গাঁটছড়া, সাধ্যমতো মিডিয়ার উপরে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির মুখে চুমো খেয়ে বেকার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে প্রতিশ্রুতির বানবন্যা—এটাই কি বামপন্থী রাজনীতির অধুনাতম দায়বদ্ধতার নমুনা? ছোটোখাটো কাহিনীর কোলাজে এমন প্রশ্নই তোলে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। সব্যসাচী সেন বলেছেন, ঠিক উত্তর দেওয়ার মত, একটা ঠিক প্রশ্ন তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন করলেই নেমে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লাল চোখ, তাহলে?

সব প্রস্তাবই চলে যায় ঠান্ডাঘরে। সত্তরের জরুরী অবস্থায়, সিদ্ধার্থশঙ্করের মতোই বামপন্থী নেতা চোখ রাঙায়। কেউ তাদের বিপক্ষে কিচ্ছুটি বলতে পারবে না। মতে না মিললেই সে হবে ক্রোধের শিকার। বুদ্ধিজীবীও হবেন 'দক্ষিণপন্থী'। তাই ইন্দ্রকে এক বামপন্থী নেতা চোখ রাঙিয়ে বলেন 'কেউ কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরে না। জানিস তো?' এটাই ক্ষমতা আর প্রতাপের কণ্ঠস্বর। কনফ্রন্ট এবং কনফেশন দুটোই সেখানে সংঘটিত খাদে ফেলে দিতে পারে আমাদের।

সব্যসাচীর দৃষ্টি তাই এই সময়ে দাঁড়িয়ে যতোটা পাগলের, তার থেকে ঢের বেশি বিবেকের। সেই মানুষটির মধ্য দিয়েও আমরা নিজেদেরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি। থেকে থেকেই তার বমি পায়। ছাবিবশ বছর পর ফিরে আসা সব্যসাচী আজ তার ছেলে ইন্দ্রকে চেনে না। কমিউনিস্ট বাপ-মায়ের ছেলে ইন্দ্র প্রয়োজনে তৃণমূল কংগ্রেস করে। প্রয়োজনে বি জে পি-ও করতে পারে। বাবাকে সে 'পক্ষ অবলম্বন' করবার জন্য যারপরনাই অনুরোধ করতে থাকে। সমাজ ও সময় ছাবিবশ বছরে বদলে গেছে অনেকটাই, তার স্বপ্ন যেখানে অবান্তর।

ছেলেবেলায় বাবার কোলে শুয়ে সে 'কারার ঐ লৌহকপাট' ভাঙবার স্বপ্ন দেখতো। উপলব্ধ সমস্ত চরিত্রমহিমা হারানো, আদর্শ খোয়ানো এ কোন সন্তানকে দেখছেন তিনি? ইতিহাসের ধারা কি তবে পাল্টে গেল? অসম্ভব। তবু এ কোন্ বন্ধ্যা রাজনীতির ব্যূহ? বিপর্যস্ত মূল্যবোধ এভাবে কেন গ্রাস করলো তার পার্টিকে? সন্তানকে? প্রশ্ন জাগে সব্যসাচীর মনে।

আপসহীন বিপ্লবের কথা ভারতের তাঁরা একসময়। এখন বাম-ডান একাকার দেখে তার বমি পায়। ধান্দাবাজির বাণ ডেকেছে যখন, তখনই স্বপ্নে সব্যসাচীকে পার্টির দায়বদ্ধতার ইস্তাহার শুনিয়ে যান কমরেড স্তালিন। এখানে আবার বর্তমানের মাঝখানে অতীতের যাওয়া-আসা। নেহাতই একটি বালক আসলে তার ত্রন্দ্বপুন্দ্র-স্মাজস্পন্দন্দ্বস্তুব্ধনস্ক. এমন একজন মানুষের ইচ্ছাশক্তিই ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে না কি? কতো সোনালি ভবিষ্যৎকে হেলায় ছুঁড়ে ফেলে লেনিন-স্ট্যালিনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা সেদিন আত্মদানের সর্বনাশা যজ্ঞে নেমেছিলেন। আজকের অঙ্ককষা, হিসেবি রাজনীতি নিয়ে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। অথচ ইন্দ্র যেন সেই দলেই বিলঙ্ করে। দেখে কষ্ট হয় সব্যসাচীর। আপাতনিস্পৃহ, চাপা, ক্রুদ্ধ আর্তনাদ ঝরে পড়ে।

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনবরত ত্রিমুখী আসা-যাওয়া এই নাটকের একটি বড়ো মাত্রা। ইন্দ্রর মা, সব্যসাচীর স্ত্রী রাজলক্ষীর ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন মায়া ঘোষ। তিনি সবসময় ভাবেন সত্তরের অতীত সুখের। তিনি শুধুই অতীতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন।

সব্যসাচীর একদা সতীর্থ ও এখন প্রতিস্পর্ধী রাজেন দল ছেড়ে নকশালবাড়িকে সেলাম জানাতে গিয়েছিলেন। ২০০২ সালে সে সাইকেলআরোহী দুই যুবকের কাছে 'ল্যাংড়া রাজেন'। রং বদলে আর সে অন্য পার্টিতে যায় নি বহুরূপীর মতো। অথচ সে বিবরবাসী, কোটরগ্রস্ত এক মানুষ। পাগল মানুষটি যথার্থই প্রশ্ন করে 'ওদের দুটো পা যে সুস্থ আছে রাজেনেরই জন্য এটা ওরা বোঝে না কেন? নাটকের এক চরিত্র সনৎ চক্রবর্তী, পার্টির বিপদের দিনে 'বসে' গিয়েছিল, এখন খুব 'উঠেছে'। মিডিয়ার সঙ্গে তার খুব দহরম-মহরম আছে। সে যেন ধান্দাবাজি রাজনীতিরই এক চেনা প্রতীক। গর্বাচভ, চেসেস্কু, পেরেস্ত্রৈকা বিদেশেও তাই সত্যি হয়।

সব্যসাচী-রাজেন দু-জনই একসময় 'একই নোকায় দাঁড়ি' হয়ে উপলব্ধি করেন যে তাঁদের স্বপ্ন এখনো অধরাই রয়ে গেছে। এই দুই পুরোনো বন্ধুর ধুন্ধুমার বিতর্ক এবং বোঝাপড়া থেকে আমরা আবার নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করি। এইভাবেই এই নাটক আমাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়কে বাড়িয়ে দেয়। স্মৃতি ও মানসিক ভারসাম্য হারানো পাগলের কথাকেও অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের চেয়ে।

এ যেন জীবনানন্দের ভাষায় 'অন্ধকার সমুদ্রের মাঝখানে আমি ডুবে যাচ্ছি একা'। নির্বাসিত মন পালক ছিঁড়ে জেগে ওঠে। এই ঠাণ্ডা সময়ে চাদর চাপা দিয়েও কমিটেড বিপ্লবী যখন শীতে কাঁপতে থাকেন, তখন 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' নয় আর। 'বন্দুকের নলে গুলির বদলে, নিরোধ পোরা থাকবে।' অর্থাৎ বিপ্লবের জন্ম হবে না আর। বাস্তবিকপক্ষে এই দুই দৃশ্যে সব্যসাচীরূপী দেবশঙ্কর হালদারের অসামান্য অভিনয় আমাদের স্নায়ু পর্যন্তই কাঁপিয়ে দেয় না শুধু, প্রতিবাদী হতে শেখায়। তিমির বিনাশী হতে চায় মন। ব্রাত্য-দেবেশ এতোখানি সাহস কোথা থেকে পেলেন? ওদের হাত ধরেই চেপে ধরি বুকের ক্ষত। মুছে নিই দাগ। এই নাটকের বুক হাতড়ে খুঁজে নিই প্রশ্নচিহ্ন, অক্ষর শব্দ-

অনুভূতিমালা। প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয় উত্তরসুরীদের মধ্যে। হারিয়ে ফেলা 'সময়'টা এভাবেই উঠে আসে ব্রাত্যর নাটকে।

অন্যদিকে মৃত্যুর মতো ঠান্ডা দেহ নিয়ে উঠে আসে একদল সরীসৃপ। আজীবন গুঁড়ি মেরে থাকা ধূর্ত নিশাচরের দল, জেব্রা-ক্রসিং ধরে নয় শুধু, চতুর্দিকে দিয়ে। দূরদর্শনের চ্যানেলে ইনটারভিয়্যু দিতে গিয়ে সব্যসাচীর তাই অখন্ডনীরবতা। বদলে যাওয়া বন্ধুর মুখও তার অচেনা লাগে। অন্যদিকে প্রতিবাদী চেতনা না হারানোর জন্যই মরে গিয়েও সব্যসাচী আমাদের মনে বিস্তৃতি শিকড় চারিয়ে দেয়। অভিনব সিনেম্যাটিক এই নাটকের শেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। সব্যসাচীকে মনে হয় দীর্ঘ এক গাছের মতো। রবিশংকর বল এক্ষেত্রে ইন্দ্রর প্রতিহিংসায় সব্যসাচীর মৃত্যুকে স্ট্যালিনেরই ডিকনস্ট্রাক্ট্ রূপ হিসেবে দেখেন, আমরা সেভাবে ভাবতে পারি নি।

অথচ একটু আগেই প্রথম দৃশ্যে মন্ত্রীর পিছনে ছুটে চলা (পার্কের দৃশ্যে) তেলবাজ পুলিশ অফিসারটিকে দেখিয়ে দিতে ব্রাত্য ভোলেন না। এখানেই তাঁর জিৎ। সাতাশ বছরে লাল রং কি একটু বিবর্ণ নয়? মনে পড়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন 'শূণ্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে সেকথা জানো না?' ফেলে আসা দিন হাঁটুমুড়ে বসে ফিসফিস করে জানি জানি। বাংলার প্রতিবাদী ঐতিহ্যের কথা।

'উইঙ্কল টুইঙ্কল' এভাবেই আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। রুদ্রবাবুরও মনে হয়, ছোটোখাটো পোষা হাতি হতে গিয়ে আমরাও ভেতরের বুনো হাতিটাকে ভুলে যাচ্ছি। তবু নিজের চারপাশের সমকালকে বিচার করতে চাই এমন নাটক দেখার পর। হারিয়ে যাওয়া, ফিরে না আসার কথায় থাকে কৌশিক গাঙ্গুলি কিম্বা অভিজিৎ সিন্হার অপমানিত, রক্তাক্ত মুখ।

সাংঘাতিক স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয় সব্যসাচীর মনেও। নিজের ভেতরের গুপ্ত আলোড়নের এবং ঘৃণার প্রকাশ থাকে তাঁর বমিতে। সাহসী অনেক প্রশ্নও তিনি ছুঁড়ে দেন আমাদের দিকে। মনে পড়ে, 'ভাষানগর' পত্রিকার একটি সংখ্যায় অদ্রীশ বিশ্বাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাত্য তাঁর নাটককে বলেছিলেন 'কনফেশন বক্স'। সব্যসাচীর মধ্য দিয়ে ব্রাত্য আসলে নিজেকে খোঁড়েন, খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেন নিজের সময় ও সমাজকে। এই আত্মখননটাই আসলে প্রধান কথা। পার্টির বিশ্বায়ন নয়, শুধু, বিপন্নায়নকে তিনি দেখান। সেখানকার ড্রন্দ্বন্ধদ্বপ্পস্ফস্ত প্সন্দ্র ত্নপ্সভ্রন্দ্বজ্ঞ-এর সাংঘাতিক অগণতান্ত্রিকতাকে দেখান। ব্রাতার সৃজনে-মননে দ্বিচারিতা নেই কোথাও। তাই সরাসরি বলতে পারেন, 'ইতিহাস প্রকৃত অর্থেই নিষ্ঠুর এবং তা নির্মম আর করুণও বটে। তোমার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় বা মূল্যায়ণে যদি ফাঁক থেকে যায়, তোমার যদি কোনো ভ্রান্তি হয়, তোমোর বিচারে পক্ষপাত থাকে, তাহলে একদিন সময়ের গর্ভ থেকে উঠে এসে তোমারই সন্তান...তোমাকেই সে হত্যা করবে।' (ভাষানগর, অদ্রীশ বিশ্বাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকার)। তাই তথাকথিত আদর্শচ্যুত বামপন্থীদের সমালোচনার সাহস ব্রাত্য দেখাতে পেরেছেন। একক, নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের কথা ভাবতে পেরেছেন।

দমনমূলক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে, আসলে বিবেকের তীব্র তাড়নাতেই এসব নাটকের জন্ম হয়। আমরা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনি। ব্রাত্য তাঁর কাজের জায়গাটিতে খুব স্বচ্ছ বলেই বলতে পারেন 'আমি সেই সমস্ত নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে লিখতে চাই, স্তুনস্তুন্দ্ব -এ যাদের মেলানো যায় নি, ৰ্দ্ধড়ন্দ্বপ্সজ্ঞস্ত-র মধ্যে যাদের আঁটা যায় নি, কোনও নির্দিষ্টি কাঠামো বা ছাঁচের মধ্যে ফেলা যায় নি, অথচ যারা অস্বস্তি তৈরী করেছে, স্তুনন্দ্বদ্ধত্তজজ্ঞকরেছে—তাদের হয়ে লিখতে চাই। তারা হয়তো আমার থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী, তাদের হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—হ্যাঁ আমি তাদের হয়ে লিখতে চাই। এবং লিখে যদি আমাকে বেঁচে থাকার ন্দ্রজ্জ্বপ্পন্দ্ব-এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয় তাতেও কোনও আক্ষেপ থাকবে না। হ্যাঁ, সব্যসাচী সেন ঠিক এই মানসিকতাতেই ব্রাত্যর যথার্থ দোসর বা ট্রপ্তদ্ধন্দ্বজ্ঞ ন্দ্বঞ্চপ্স হয়ে ওঠেন। মনে পড়ে ঘুরে দাঁড়ানো বিপ্লবীদের কথাও। গদ্দর-এর উচ্চারণ 'ত্মন্দ্বপ্সপুদ্ধ নন্দ ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব প্তভ্র প্সন্দ্রত্রদ্ধত্তজন্দ্ব.'

এই নাটকে মনে করিয়ে দেয় উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'কল্লোল' কিম্বা 'ব্যারিকেড'-এর কথা। মনে পড়ে ১৯৭৫-এ অজিতেশ-কেয়ার 'আন্তিগোনে' নাটকের বিজ্ঞাপন, 'কোলকাতার রাস্তায় মৃতদেহ আকাশে শকুন মঞ্চে আন্তিগোনে।' সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জরুরি অবস্থায় সময় যে নাটক বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে কখনো উপেক্ষা, কখনো উৎকোচ, কখনো রক্তচক্ষু এ আমাদের চেনা ছবি। এ নাটকও বামপন্থীদের উত্থানের মূল সেলফ্ ক্রিটিসিজম্ নয় তো? কি জানি? তবে সবার উপরে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' ভাবতে শেখায় আমাদের। অন্ধতার পলিমাটির আস্তরণ ভেদ করে সময়ের নদী থেকেই উঠে আসে নতুন চর। সেখানে অনেক পলিমাটির আস্তরণ ভেদ করে সময়ের নদী থেকেই উঠে আসে নতুন চর। সেখানে অনেক ঝড়জল, জোয়ার-ভাঁটার চিহ্ন। জেগে ওঠে জনপদ। জেগে ওঠে মাটি। অজান্তেই একটা নতুন রাজনীতি আমাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মতো মিশে যেতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নে দেখা দৃশ্যে গণহত্যাকারী স্ট্যালিনই কেন এলেন—বোঝা গেল না। লেলিন কিম্বা মার্কসও তো আসতে পারতেন।

নাটকের বাইরের কাঠামোর গভীরে অশ্রু ও আগুনের, ভালোবাসা ও প্রতিবাদের গহন কাহিনী চাপা থাকে। স্বপ্ন দ্রষ্টা প্রতিবাদী বাঙালী ও তার নাটক যখন লোকসাহিত্যের চর্চায়, প্রতীক-সংকেতের অসহ্য বাড়াবাড়িতে, কবিতার বাহুল্যে, ক্ষমতালেহনে, নিছক অনুবাদের চোরাবালিতে, সমঝোতা, আপস আর ব্যাক্তিগত স্বার্থপূরণের জলা জমিতে ডুবে যেতে বসেছে, তখন এই নাটকের অর্ন্তবস্তুতে থাকে বিশুদ্ধ বিপদের আবাহন। তবু বিবেকী বিদ্রোহের এই পরম্পরায়, আসুন আমরাও গলা মেলাই। বন্ধনী নয়, বিস্ময়কর আবির্ভাবে, কায়েমি শক্তির দিকে বজ্রমুষ্টিতে, এক বেপরোয়া স্পর্ধায়, সব ঘূর্ণির উপরে ব্রাত্য-র সঙ্গে 'আমি আছি, আমরা আছি, সৃষ্টি এবং সংগ্রামে'।

হিন্দোল ভট্টাচার্য ও সত্য ভাদুড়ি

উইঙ্কল টুইঙ্কল

''এরকম কেন হয়ে গেল তবে সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?''
(ভাষিত জীবনানন্দ দাশ)

প্রাক-কথন

রাজনৈতিক নাটকের একটা সমস্যা হচ্ছে, যখন সেগুলি যুক্তির কথা বলে, তখন যুক্তি ছাড়া আর কোনও কিছুর কথাই সেগুলি বলে না আর যখন যুক্তিকে আশ্রয় করে মানবিকতার ভাব-জগৎ-এর কথা বলে তখন হয়ে পড়ে সেন্টিমেন্টাল—মানবিকতার পোশাকে হীনমন্যতার আড়ম্বর। মূলত বামপন্থী আন্দোলনকে পটভূমিকায় রেখে গড়ে ওঠা বাংলার রাজনৈতিক নাটক সংসদীয় বামপন্থী আন্দোলনগুলিরই মতো, উচ্চকিত, একপেশে, একরৈখিক এবং পোশাকী। তাই বিগত শতকের সত্তর দশকের পর থেকে আশি ও নববই দশকে ঐ বামপন্থী আন্দোলনের পোশাকের রঙ যত ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে, তেমনই রাজনৈতিক নাটকগুলো হয়ে উঠেছে শুধুই—নাটক মধ্যবিত্ত, নস্টালজিক, দূর থেকে দেখা, আড়াল থেকে দেখা তথাকথিত সাবঅলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গির চর্বিতচর্বণ। রাজনীতিকেও রাখবো, আবার রাজনীতির দ্বন্দ্ব ও মূল প্রেক্ষাপটের অন্তর্বস্তুকে ছোঁবো না—এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোত্রের গোত্রহীন তথাকথিত নাট্যপ্রক্রিয়া মূলত প্রোপাগান্ডা নির্ভর অথবা র‍্যাডিক্যালজিম্ হয়ে দাঁড়ানোর রাজনৈতিক নাটকগুলি কখনোই ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জে জানাতে পারেনি। কারণ উনিশশো সত্তর পরবর্তী বাংলা তথা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের রাজনীতি আর সহজ, সরল, একমুখী নেই। সাম্রাজ্যবাদ রূপান্তর হয়েছে বিশ্বায়ন নামক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদে। ধনতন্ত্র তার কার্যপদ্ধতি বদলে ফেলেছে। সোভিয়েত ভেঙে গেছে। কমিউনিস্টপার্টির এবং মতবাদের ভিতরেও লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিজমের বাঘনখ আমরা দেখতে পেয়েছি। উল্টোদিকে বিশ্বে আরও একটি বিশ্বায়নের জন্ম হয়েছে, যা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি—এবং তা হল, ধর্মীয় মৌলবাদ-ও তার সন্ত্রাসবাদের বিশ্বায়ন। যেমন এই মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ ভারতবর্ষে হিন্দু-মৌলবাদের রূপে ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো ভয়ঙ্কর, তেমনই তা পশ্চিম-মধ্য এশিয়া ও

বাংলাদেশে, ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম মৌলবাদের মতো আন্তর্জাতিক। এই মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত হানলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কিন্তু আঘাত করেনি, করেছে পুঁজিবাদী শক্তির কেটি বিশেষ স্তম্ভকে। এ হেন পরিস্থিতিতে চীন যেমন বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে লোকালাইজেশনের অর্থনীতিরও বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে, ভারতবর্ষ কিন্তু তা পারেনি। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে তাল মেলাতে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, যা মূলত সংশোধনবাদী একটি সাধারণ ডেমোক্রেটিক পার্টিরই জন্য এক প্রতিনিধিম মাত্র, সাদরে গ্রহণ করছে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি, অর্থনীতি। প্রকৃতি প্রস্তাবে, এখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিজ্ঞাপনের নেতৃত্ব এই কমিউনিস্ট পার্টিগুলোই করে। তাই রাজনীতি এখন খুবই সুক্ষ্ম এবং এই সুক্ষ্মতাকে ছিন্ন করার চেয়েও প্রয়োজনীয় যেটা, তা হল সুক্ষ্মতা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলা। আজকের রাজনৈতিক নাটক এই প্রয়োজনীয় কথাগুলিই চায় বানানো, সাজানো, নিরুত্তাপ হিতোপদেশ নয়।

১. ব্রাত্য বসুর 'অশালীন' আমরা দেখেছিলাম। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে উপচ্ছায়া সংলগ্ন অর্থহীনতা থাকে, তা ব্রাত্য ধরতে চেয়েছিলেন। তারপর 'অরণ্যদেব' 'শহর ইয়ার' 'মুখোমুখি বসিবার' এবং 'ভাইরাস-এম'-এ বোঝা যাচ্ছিল চারপাশে যে নাটক আমরা দেখছি, পড়ছি, তার চেয়ে তাঁর এক আলাদা কণ্ঠস্বর আছে। বলার কথা আছে। কিন্তু সেই বলার কথাগুলোই কোথায় যেন উপস্থাপনা আর চিন্তার গ্রন্থনায় অভাবে হারিয়ে যেত, স্পষ্টভাবে বিদ্ধ করতো না। কিন্তু ব্রাত্য-র চিন্তার এই অসম্পূর্ণতারও যে একধরনের নিজস্ব জার্নি ছিল, তা আমরা বুঝতে পারতাম, অথচ শেষ অবধি ঐ অসম্পূর্ণতারই কারণে বেজে উঠতে পারতাম না। কিন্তু 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এ এই অসম্পূর্ণতার আড়ষ্টতা নেই। মানবিকতার অতিরিক্ত ভাবাবেগ নেই। যা আছে, তা বাস্তব। রূঢ় বাস্তব, কিন্তু সেই বাস্তবকেই তো আর আগের মতো ক্যাথারসিস করে তোলা যায়না, তাই ছাবিবশ বছর আগে এক সৎ বিপ্লবীর স্বপ্ন-দেখা চোখ ঘুম থেকে উঠে আসে বাস্তবিক সময়ের একমুখীনতাকে অতিক্রম করে। শীতকালীন ঘুমের মতো কেবল যে খোলস আমাদের এই সমাজ পরিত্যাগ করে এসেছে, যে সামাজিক পরিকাঠামো, ভাষার পরিকাঠামোগুলোর পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেই তথাকথিত 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'-তে উনিশশো সত্তরের দশকের পুলিশের তাড়া খাওয়া বিপ্লবী সব্যসাচী তার নিজস্ব সময়ক্রমকে নিয়েই নতুন এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় জেগে ওঠে, এইসব পরিবর্তনের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে যেন আমাদের ভিতর ঘুমিয়ে থাকা সেই সময়, যাকে আমরা ফিরে পেতে চাই, যে, অঘ্রাণের অন্ধকারে হেঁটে যাওয়া শক্ত মানুষের হৃদয়ের পথে হানা দেয়, আমাদের বিদ্ধ করে, আমাদের নিজেদেরই দিকে প্রতিবিশ্বের মতো ভেসে ওঠে। আমাদের ভেতরে যে সংশয়, তা তো বিলীন হয়ে যাওয়ার সংশয়। আমরা তো জানি, মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরেনা কখনো। কিন্তু মাথার ভিতর যে বোধ জন্ম নেয়, তা হারিয়েও যায় না, চাপা পড়ে থাকে মাত্র। এই চাপা পড়ে থাকা অস্তিত্বকে মাঝেমধ্যে খুবলে আনতে হয়। না হলে, চাপা পড়তে পড়তে 'বিশেষ সময়' আর সময়ের ভাবনার বিকাশগুলি পরিবর্তিত হয় প্রত্নে, মিউজিয়াম পিস্ হিসেবে সেগুলি হয়ে উঠে সংরক্ষণযোগ্য, পণ্য। তাই এক কালের বিপ্লব এখনকার অধিকাংশ শিল্প মাধ্যমে কেবল পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু চিন্তা তো কখনো পণ্যের আস্তরণে বাঁধা পড়তে পারে না। কারণ যে চিন্তা শরশয্যায় জন্মলাভ করে, তার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা যেমন বাড়ে, যেমন সময়ের পাললিক আস্তরণে সে হয়ে ওঠে দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইটের মতো, তেমনই সে একদিন নিস্তরঙ্গ, কবরের মতো শান্ত ভূমিরূপেও ফাটল ধরায়। চ্যুতির জন্ম হয়। বেরিয়ে আসে পৃথিবীর হৃদয়ের লাভা। যতদিন পর্যন্ত না তার এই বেরিয়ে আসাটা সংগঠিত হয়, ততদিন আমরা বুঝতে পারিনা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ভিতর লুকিয়ে থাকা লাভার উত্তাপ। নকল পাহাড় গড়ি আমরা। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকেই একদিন, স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ নকল পাহাড় ভেঙে যায়।

হিপোক্রিসি, রাজনৈতিক মেগালোম্যানিয়ার এই একবিংশ দ্বিতীয় বছরে ঐ নকল পাহাড় আমরা চিনি। আমরা জানি, একদিন একটা 'ভাবনা' ছিলো, ভাবনার 'তীব্রতা' ছিলো। কিন্তু ঐ নকল পাহাড়ের নকল ঝর্ণার জল আমাদের পান করতে হয়। তাই আমরা চুপ করে থাকি। এই সমাজটা অনেকটা ঐ নকল পাহাড়ের মতো। আদি কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল ভাঙতে—'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবনা ছিলো। নকশালেরাও অন্যরকমভাবে চেয়েছিলো সমাজবদল—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' কিন্তু সময়ের সমুদ্রের পারে কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে সেই সব ভাবনাগুলো এখন অস্থিরভাবে এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্ন কঙ্কালের মতো ঘুরছে। এমনটা নয়, কেবল প্রতিকুল শক্তিই তাদের বিনষ্ট করেছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব ভ্রান্তি, রাজনৈতিক সংস্কার নামক সংসদীয় সংকরায়ন যে চ্যুতির বীজ বপন করেছিল, তারই ক্রমপ্রসারিত হাত দুহাত ভরে গ্রহণ করে নিয়েছে এই নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ, সুখে থাকা, অস্বস্তিতে থাকা পৃথিবীকে। তাই ছাবিবশ বছর পর সব্যসাচী বুঝতে পারে না গ্লাসনস্ত, বা পেরেস্ত্রৈাইকা, চেসেস্কুর ভূমিকা তার কাছে অপরিচিত থেকে যায়। বার্লিন দেওয়াল ভেঙে পড়ার খবর সে জানেনা। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ই-মেল, মাইক্রোচিপস শব্দগুলো আমাদের মতো তার জীবনের শরিক হয়ে ওঠেনি। এই রাজনৈতিক সংবাদ সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত থাকে, যে সিপি আই এখন সি পি এম-এর শরিক। গ্লোবালাইজেশন, রামমন্দির-ম্যাকডোয়েল-মোহনবাগান-রাজীব গান্ধি-মেট্রোরেল, পোস্টমর্ডান-তৃণমূল কংগ্রেস-তপন সিকদার, এনরন। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষ নেওটিয়া, লাদেন, পেটো, পোকো-র অতিনির্ণীত স্থ্নন্দ্বজস্তন্দ্বন্ধন্দ্বজপ্নন্দ্বস্ত পৃথিবী তার কাছে বিদেশী, অচেনা, ভিনগ্রহের শব্দের মতো লাগে। সে কী চেনে তার ঘরকেও, তার আত্মজাকেও—সব্যসাচীকে শুনতে হয় তার ছেলে তৃনমূল কংগ্রেস করে আর স্বাভাবিকভাবেই তৃনমূল আর কংগ্রেসের মধ্যে কোনও সম্পর্ক সে খুঁজে পায় না। ছাবিবশ বছর পর একই যুবক শরীরে প্রৌঢ়া স্ত্রী সামনে বসে, আমাদেরই মতন তার বমি পায়, সে থুতু ফেলতে চায় এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর। মনে পড়ে সার্ত্রের নসিয়ার কথা, যেখানে সার্ত্র বলেন— 'বড়ন্দ্ব স্তুত্তবন্দ্ব নব্দক্সব্ধ ন্ডব্দনস্তুন্দ্ব প্লন্দ. ঢ স্তু ন্দ্রন্দ্বন্দ্বপ্ত নব্ধ স্লন্দ্বজ ব্ধড়ন্দ্বজন্দ্ব প্স ব্ধড়ন্দ্ব স্তুপ্তপ্ত, প্স ব্ধড়ন্দ্ব স্তুত্তন্দ্বব্দ ন্দ্বন্দ্বজস্তুভ্রড়ন্দ্বজন্দ্বব্রজপ্সক্তস্ত প্লন্দ্ব, নব্ধ নব্দ প্সন্দ্ব ভ্রনব্ধড় ব্ধড়ন্দ্ব স্তুব্রন্দ্রন্দ্ববব্দ নব্ধ নব্দ ঢ ভ্রড়প্সত্রপ্ল ন্ডব্দনস্তুন্দ্ব নব্ধ' সব্যসাচীও স্পষ্ট বুঝতে পারে সে একজন প্সত্তব্ধব্দনস্তুন্দ্বজ, তবু সে বিশ্বাস করে এই বাস্তবতাকে, সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, সে বলে—আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এটা ২০০২। নতুন সময়। নতুন দিন। নতুন শব্দ। পুরোনো সময় মরে গেছে পুরনো দিন চলে গেছে, পুরনো শব্দরা হারিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা পুরনো মানুষ হঠাৎ ফিরে এসেছে আজকের দিনে। কেমনভাবে দেখবে সে এই নতুনলোক? কেমনভাবে দেখবে সে এই নতুনগুলোকে? কেমনভাবে বুঝবে? খাপ খাওয়ানোর বাইরে অন্যকোন রাস্তা কি সে খুঁজবে—নাকি মাথা নিচু করে মরে যাবে, একদিন আরও অনেকের মতো?...'আমায় মাখনদা বলেছিল একটা ঠিকঠাক উত্তর দেওয়ার মতো একটি ঠিকঠাক প্রশ্ন করতে পারাটাও সমান জরুরি। রাজলক্ষ্মী—আমি ঠিক প্রশ্ন করতে পারছি তো, গুলিয়ে যাচ্ছেনা তো আমার—এই নতুন সময়ে, নতুন দিনে, নতুন শব্দে। বলো কমরেড, বলো আমায়'।

''যে মিস্ত্রি নিজে নিজের তৈরী
নির্মাণ নিজে চিনছে না
সে কিভাবে হয় নিজের স্রষ্টা
সে হিসাব আজো মিলছে না''
(তোমার ঝাণ্ডা বইবে কে ফরহাদ মজহার)

সব্যসাচীর সঙ্গে তার ছেলে ইন্দ্র-র যে ব্যবধান তৈরী হয়, সেরকমই ব্যবধান তৌরি হয়েছিল একটা সময় তার সঙ্গে তার বাবা বিনয়ভূষণের। এই বোঝা না-বোঝার খেলা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চিরন্তন, তার রূপের বদল হয় মাত্র। কিন্তু নিজেরই নির্মাণ যখন নিজেরই পবিবর্তিত পরিস্থিতির স্রষ্টা হয়ে ওঠে, তখন হিসেব মেলেনা। তাই ইন্দ্র, সব্যসাচী, রাজলক্ষ্মীর কথোপকথনের মধ্য নিয়ে এই হিসেব না-মেলার ক্লাইম্যাক্স ছারখার করে দেয় চরিত্র এবং দর্শকদের পরিবর্তত পরিস্থিতি।

''ইন্দ্র মা, ওকে সত্যিটা বুঝতে দাও। সত্যিটা বোঝা ওনার দরকার। আপনি শুনুন সব্যসাচী সেন শুনতে পাচ্ছেন আপনি। এটা জানুয়ারি মাস—২০০২ (প্রায় কলার ধরে) শুনতে পারছেন—জানুয়ারী ২০০২। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এখন পাল্টে, দেবার হাওয়া বইছে। আপনাকে এটা শুনতে হবে এবং খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

সব্যসাচী না না। এখন জরুরী অবস্থা

ইন্দ্র না। এখন শীতল অবস্থা।

সব্যসাচী কী?

ইন্দ্র ঠাণ্ডা লাগছেনা আপনার? ঠাণ্ডা?

সব্যসাচী তা, ঠাণ্ডা পড়েছে একটু।
ইন্দ্র সেটা ১৯৭৬ নয় নয়। ২০০২ এর ঠাণ্ডা। আপনার সময়ের উল-কাঁটাটা সোয়েটার বুনে পাল্টে দিয়েছে সব। আপনি জানেন না; খেয়াল করেন না বা খেয়াল করতেও চান না। আচ্ছা, বলুন তো এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে?...''

সব ওলোট পালোট হয়ে যায়। সত্যিই ভীষণ শীত করে তখন। সব্যসাচী না হয় সরীসৃপের মতো, উইঙ্কলের মতো শীতঘুমে তলিয়ে ছিলেন, জানতেন না এই পরিবর্তনক্রিয়ার প্রতিটি ফাঁক ফোকর, কিন্তু আমার তো জানি, আমাদের শীত করে তাই। এই শীত আরো ছড়িয়ে যায়। জয় গোস্বামীর প্রত্নজীবের মতো মনে হয় নিজেদের। ভুতুম ভগবানের মতো চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। টি.ভি. চ্যানেলের নির্দেশক, কেউ বা হতাশ, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সব্যসাচী কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনা চ্যানেলের ইন্টারভিউ-এ। তার আবার বমি পায়। বমি বাড়াতে থাকে। ''আমি জানি আগামী পঁচিশ বছর আমি বা আমরাই পার্টিতেই বেশি করে থাকবো'...বমির শব্দ বাড়ে। ইন্দ্র, আমাদের মনের কথা বলে তখন, অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব এক সুক্ষ্ম রাজনীতিরই কথা বলে সরল, সহজভাবে—'আপনারা এই সোসাইটিতে এখন বাতিল, লঝঝড়ে, বুঝতে পারছেন? আপনার নিজেকে নিয়ে কষ্ট হচ্ছে না? মনে হচ্ছেনা যা ভেবেছেন, যা করছেন, যা বলেছেন তার কোনোটারই আসলে কোনও মানে নেই। নিজেকে ডাস্টবিন লাগছেনা? দেখুন সব্যসাচী—তিরিশ বছর পর আপনার দুনিয়াটা এইভাবে পাল্টে গেছে। মাথায় কোনো ছাতা নেই, পাশে কোনও শিবির নেই, সঙ্গে কোনও মিছিল নেই—আপনি এখন একা। পুরোপুরি একা। (সব্যসাচী এগিয়ে ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে। তারপর তার গায়েই বমি করতে শুরু করে। (বমির শব্দের মাঝে ইন্দ্র বলতে থাকে) 'পক্ষ নিন সব্যসাচী পক্ষ, কোনো না কোনো পক্ষ আপনাকে নিতেই হবে। সঙ্ঘ ছাড়া, পক্ষ ছাড়া, শিবির ছাড়া আপনার ভবিতব্য হবে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো—সেও ঘুম থেকে উঠে এসে কারোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেনি, কারোর সঙ্গে না। পক্ষ নিন সব্যসাচী। কোনো না কোনো পক্ষ।' হ্যাঁ, এইটাই এখন সরাসরি রাজনৈতিক নাটকের ভাষা। এই একা মানুষের রাজনীতি এখন রাজনীতির মূল অস্ত্র। তাই পঙ্গু রাজেন মিড্‌লক্লাস সম্বন্ধে বলে ওঠে—'এরা ভাবেনা নতুন জেনারেশনের যেসব ছেলেরা, এখনও ভারতের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে থেকে লড়ছে—এরা যদি সত্যিই একদিন প্রকৃত অর্থে সংগঠিত হয়, পশ্চিমবাংলার, বিহারের, উত্তরপ্রদেশের, অন্ধ্রের, হরিয়ানার ভূমিহারা কৃষকেরা যদি একদিন বন্দুক ওদের দিকে উঁচিয়ে বলে তুই যেগুলি ভোগ করছিস—সেগুলো আসলে আমাদের রক্ত দিয়ে তৈরী, দে ওগুলো ফেরত দে,—তখন কি বলবো আমরা—'। প্রশ্ন, এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরাই একজন তরুণ নাটককার করতে পারেনা। কেননা, এই নিথর, শীতল অবস্থার মধ্যে শিল্প যদি আক্রান্ত করে মানুষকে, তবে মানুষ ভাবতে পারে, অথবা নয়। এই নাটকের উদ্দেশ্য নয় চন্দনচর্চিত সান্ধ্যভাষায় সম্পর্কের শঙ্কমোচন, এ নাটকের উদ্দেশ্য নয় রাজনীতিকে পণ্যভাবে ব্যবহার করে অরনীতির বাতাবরণ সৃষ্টি। এ নাটকের উদ্দেশ্য নয় দেনাপাওনার রাজনীতির তথাকথিত মানবিকতার দৃশ্যায়ন। এ নাটক কোরাপুটের লাল আগুনের মতো, শ্রীকাকুলামের লাল আগুনের মতো, চম্পারণের লালআগুনের মতো, ডেবরার লাল আগুনের মতো, চোখের সামনে হু হু করে ছুটে আসে। এখানেও আমাদের হিসেব মেলেনা। কেননা, রাজনৈতিক থিয়েটারের নামে পার্টিজান ধ্যাষ্টামো এ নাটকে নেই। তাই এ নাটকই রাজনৈতিক নাটক। কেননা যে রাজনীতি আমরা খবরে কাগজে পড়ি, যে রাজনীতি খাসখবরের পর্দায় ফুটে ওঠে, যে রাজনীতি মিছিল, মিটিং ভোট তা এই রিয়েলিটির, সন্দেহ নেই, যেমন, সন্দেহ নেই, এ রিয়েলিটি চোখে ঠুলি বেঁধে জগতকে দেখার রিয়েলিটি মাত্র। নাইনটিন সেভেনটির হাওড়ার শিসমহলে ডি ওয়াই এফ এর রাজ্যসম্মেলনে স্টেট সেক্রেটারীর রিপোর্টে বলা ছিল—'টাটা বিড়লা বা মালটিন্যাশনাল কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করো—শিল্পের প্রসারের নামে পুঁজির অনুপ্রবেশ আটকাও—চাকরি চাই, চাকরি দাও—নইলে বেকার ভাতা দাও।' কি নাম ছিল তৎকালীন ওই ডিওয়াই এফ আই সম্পাদকের? সব্যসাচী ফিসফিস করে বলে—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিপিএম এবং আনন্দবাজারের বর্তমান ঘনিষ্টতার কারণও তাই আর চাপা পড়ে থাকে না।

আমরা এতদিন শুধু দেখেছি নাটকে কাহিনীর বিস্তার, রাগ, আলাপন। কিন্তু এ নাটক কোনও গল্প বলে না, যদিও গল্পের একটা কাঠামো থাকে আপামর। তাই এ নাটকের আলোচনাতেও কোনও গল্পের পরিকাঠামোর কথা তোলা হলো না। যা হলো, তা আমাদের অনুভূতি। বর্তমান এই পৃথিবীতে, স্থান, কাল ও সময়ের প্রেক্ষিতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে সংস্কৃতিকে, সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থনীতিকে—অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করছে রাজনীতিকে, আবার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে সংস্কৃতিকে। অর্থনীতি রাজনীতি এবং সংস্কৃতি এভাবেই একে অপরের দ্বারা অতিনির্ণীত। আধুনিক যুগের এই আধুনিক রাজনীতির 'স্কন্দজস্তন্দ্বন্ধন্দ্বজপ্পন্ত্বন্ধনক্ষ' উঠে এসেছে এ নাটকে। তাই বাংলার মৌলিক নাটক রচনার ইতিহাসে সময়ে দাবী মেনেই এ নাটকে রাজনৈতিক নাটক, সম্পর্কের নাটক, স্তব্ধতার নাটক, সব মিলেমিশে যাচ্ছে। কোনো কিছুকেই আর পৃথক করা যাচ্ছে না। অন্যদের খাটো না করেই তাই বলা যায়—এ নাটক অন্যতম মৌলিক নাটক হিসেবে বাংলার নাট্য রচনার ইতিহাস সংযোজিত হয়ে রইল, যা মুছে যাওয়ার নয়। ব্রাত্য কেন এ নাটক লিখলেন জানিনা তবে অনেক যন্ত্রণা দিলেন, নিশ্চয়ই, মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাদের, বলতে ইচ্ছে করছে—

'হয়তো ভাবছ তুমি এইসবই প্রলাপ, দিবাস্বপ্নের
ঘোরে এখনও আমার চিন্তা আবিল রয়েছে,
হয়ত ভাবছ আমি মোহগ্রস্ত, চিকিৎসার অযোগ্য উন্মাদ।
যা খুশি ভাবতে পারো, তর্কে আর, সত্যি, রুচি নেই।
বরং আমার স্নায়ু শিউরে উঠেছে এতদিন পর
কতদিন, ভেবে দেখো, কত-কতদিন আমি ভুলে আছি ঘর গেরস্থালি,
কে কেমন আছে তার কিছু জানিনা।'
('য়ু মে স্যে আয়াম আ ড্রিমার বাট আয়াম নট দ্য ওনলি ওয়ান।')
(জয়দেব বসু)

সত্যি, নাটক পাঠের পর আমাদের কাছে রাজনীতি আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসে। আমরা আক্রান্ত হই। ভাবতে বাধ্য হই। বাধ্য হই একবার ফিরে তাকাতে হোক তা দিবাস্বপ্নেরই ঘোর।

প্রযোজনা

ফ্যান্টাসি—আমরা জানি এর অর্থ। এক্সপ্রেশন থ্রু দ্য ইমাজিনেশান। সত্যিই কি এ নাটক তাই না কি ফ্যান্টাসির সামান্য একটু বাতাবরণ সৃষ্টি না করলে পুরো বক্তব্যটাই মুর্চ্ছা যেত। আমাদের মনে হয় তা-ই; আর এ কারণেই সুকৌশলে এটির আলতো ব্যবহার। এ নাটক উচ্চকিত। শুধুই কি তাই? না কি চোরাস্রোতের মতন এ নাট্যে আগাগোড়া প্রবাহিত হয় এক অদ্ভুত থমথমে নীরবতা—যা আমাদের চৈতন্যকে হিমশীতল করে তোলে? এ নাটক সিপি এমকে খুব দিয়েছে, নকশালকে ভেঙিয়েছে, সেটাই কি শুধু এ নাটকের বক্তব্য? আমরা যারা কম বেশি বুধমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সচেতন করারও কি কথা নেই? আসলে এই পশ্চিবঙ্গে বিগত ছাবিবশ বছরে সামগ্রিক মননের যে অবক্ষয়, সে কথাটি এ নাটক অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে আমাদের কাছে খুলে দিয়েছিল,—একটা ন্যাংটো ছেলের মতো তাই বস্তুত আমরা এই নাটক দেখে কেউ আনন্দ পাচ্ছি, গাল পাড়ছি, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারছিনা। এ নাটক কাহিনীপ্রধান নয়। চরিত্রপ্রধান। প্রত্যেকটি চরিত্রই আপন মানসিকতায় উজ্জ্বল—ভালোমন্দের প্রশ্ন আসছে না। সেই অভিনেয় চরিত্রগুলির মানসিকতাকে ঠিকঠাক পড়ে প্রত্যেকটি অভিনেতা নাট্যকলার শর্ত মেনে তা দর্শকের সামনে মেলে ধরছেন। সামগ্রিক টিমওয়ার্কের কথা ভাবলে এ বড়ো কম প্রাপ্তি নয়। টেক্সটা যদি রবিশঙ্করের মতো বাজে, তাহলে অভিনেতাদের প্রত্যেকে বেজেছেন বিলায়েতের মতো। দুটো একসঙ্গে মিলেছে। মিলেছে বলেই, শুধু নাটক নয় আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে একটা থিয়েটার। তবে এইটুকুতেই তো শুধু একটা আলাদা থিয়েটার গড়ে উঠতো না, যদি সঞ্চয়ন ঘোষ মঞ্চটাকে ঐরকম ধূসরভাবে নির্মাণ না করতেন। সামগ্রিকের ধূসরতাকে আলো দিয়ে চেনাতে না পারতেন সুদীপ সান্যাল, সঙ্গে আবহ সেটাকে বাঙময় করে না তুলতো। আসলে প্রসেনিয়ামের নাট্য মানে তো শুধু মঞ্চ নয়, এ সব কিছু মিলেমিশে যখন একটা তৃতীয় ভুবনে আমাদের নিয়ে যায়, তখন তাকেই তো বলি একটা পূর্ণাঙ্গ নাট্যকলা। এ নাট্য সেই কাজটা নিষ্ঠাভরে করেছে।

এই মুহূর্তে বাংলামঞ্চেরর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কে— প্রশ্নটা যদি বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের নিরিখে হয়, যদি উদার হতে পারি, নামটা তাহলে উঠে আসবে দেবশঙ্কর হালদার। দেবশঙ্করের সব্যসাচী দেখে মনে হয়েছে বৃহতের মুখোমুখি এ যুবক তো অনায়াসেই দাঁড়াতে পারে। মুশকিল হচ্ছে, সেরকম চরিত্র আমাদের নাটকে বড়ো কম। অনেকসময় বড়ো অভিনয় দেখেও তো অনেকে অনুপ্রাণিত হতে পারেন তাৎপর্য পূর্ণ নাটক লেখায়। দেবশঙ্কর হালদার সে কাজটা করেছেন। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ইন্দ্রে চরিত্রটি একটু টাল খায়। এই ব্যর্থতাটা রজতাভের নয়। স্বয়ং নাটককারের। ঐটুকু বাদ দিলে রজতাভের ইন্দ্র এক অর্থে জিমি পোর্টারের কথা মনে করিয়ে দেয়। আসলে সত্যিসত্যিই এ নাটকে প্রত্যেকে ভালো অভিনয় করেছেন। তবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়। ঐ যে স্তানিস্লাভস্কি বলেছিলেন—ছোট চরিত্র নেই, আছে ছোট অভিনেতা। কস্তুরীর এই চরিত্রটার অভিনয় দেখেই আমরা বাংলা মঞ্চে তাকে স্বাগত জানাবো। আমরা বলবো— অভিনয় করো হে নবীনা, আমরা আছি। দীর্ঘদিন পর বাংলামঞ্চে মায়া ঘোষ আবার ফিরে এলেন। কিন্তু নিজেকে কতটা সুবিচার করলেন? সে অর্থে তো মনে ধরলো না তাঁর অভিনয়। একটু নস্টালজিয়া কাজ করলো মাত্র। অসিত বসু গ্রহণযোগ্য। তাৎপর্যপূর্ণ শ্যামল চক্রবর্তী। দুটি দৃশ্য বেশ আরোপিত মনে হয়েছে। প্রথমটি, কিশোর সব্যসাচীর স্বপ্নে স্তালিনকে পাওয়ার দৃশ্য। দ্বিতীয়টি, টি.ভি.তে সব্যসাচীর সাক্ষাৎকারের—দৃশ্য। গ্রহণের সময়ে অন্যান্য চরিত্রগুলির আচরণ। শেষ দৃশ্যটি নিদারুণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, অন্তত আমাদের কাছে। যে স্বপ্নের দৃশ্যের কথা বললাম, নাট্যসত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটু আরোপিত মনে হলেও স্বপ্নিল পরিবেশে স্তালিন যখন হাঁটেন এবং দেখা হয় পার্কে সব্যসাচীর সঙ্গে, একথা- সেকথা বলার পর যখন লেখালেখির কথা ওঠে, নবীন কিশোর যখন গদগদ চিত্তে বলে—'আমি আপনার লেখা পড়েছি স্তালিন—আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে' এবং উত্তরে লৌহমানব বলেন— লেখালেখির প্রসঙ্গে ভালোমন্দ কথার কোনোও মানে নেই, অন্তত আমরা যা লিখি। দেশ, কাল সমাজ ও শ্রেণীগত বিচারে বলো এ লেখা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কিনা। কিশোর সব্যসাচী তন্ময় হয়ে তখন সেকথা শোনে, কোনো উত্তর দেয় না। এর উত্তর আমরা দিই এ নাটকটা দেখার পর।—হ্যাঁ পরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়—আপনার আগের নাটকও আমরা দেখেছি এই 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' দেখে বলতেই হয় পরিচালক হিসেবে আপনি এ মুহূর্তে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাট্য আমাদের দিলেন। আশা করি আমাদের স্মৃতিতে এটি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
এক ফিরে আসা মানুষের গল্প

আজকাল মাঝে মাঝে বাইরে বেরোনোর নাম শুনলেই কেমন যেন আলসেমিতে পেয়ে বসে আমাকে। ১৭ জুলাই ২০০২-ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই দিনে 'সংসৃতি' গণকৃষ্টি নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ করল তাদের নতুন নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। নান্দীকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও অভিনেতা, এই নাটকেরও একজন অভিনেতা, দেবশংকর হালদার আমাদের যাওয়া এই বলে আটকানোর চেষ্টা করেছিল যে সে তার সেরা অভিনয় এই নাটকে এখনও করেনি। অন্যদিকে গণকৃষ্টির সৌমিত্র মিত্রও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানাননি। এটা অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ থিয়েটার ও বাড়ি দুটো জায়গাতেই রুদ্রপ্রসাদ, সেনগুপ্তের মতো প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বের ছায়াতেই আমি থাকি। তাই আমি ঠিক করেছিলাম বাড়িতেই থাকব, আর ঘুমোব। কিন্তু এই নাটকের নাট্যকার ব্রাত্য বসু ও অভিনেতা দেবশংকর হালদারের প্রতি আমার স্নেহ ও ভালবাসা আমাকে শেষপর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে নিয়ে গিয়েছিল।
একটা নাটক দেখা সবসময়ই আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা, সে ভালই হোক বা খারাপ। নাট্যোৎসবের ঝলমলে পরিবেশ, হাসিমুখ, অনেক কথা, চা-কফি-ফিশফ্রাইয়ের পর পর্দা উঠল। প্রথমেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল সঞ্চয়ন ঘোষের সেট-ডিজাইন। ব্যাকড্রপের ডিজাইন, প্লাস্টিক, খবরের কাগজ ঠাসা গাছ, সবটা মিলে যেন একটা অন্য জগৎ। রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর গল্প মনে আছে তো? সেইরকমই ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে ২৬ বছর আগে পুলিস কাস্টডি থেকে উধাও একজন কট্টর মার্কসবাদী নেতা ফিরে আসেন কলকাতার কোনও একটি পার্কে। মঞ্চ অন্ধকার হয়, তার মধ্যে একজন দাড়িওলা মানুষ চোখ ভর্তি আগুন নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ফিনিক্সের মতো। সেই মানুষটি সব্যসাচী, কোন জাদুতে যেন তার বয়স আটকে রয়েছে। ২৬ বছর ধরে ঘুমন্ত সেই মানুষটি বিশ্বাস করে এখন ১৯৭৬, ৭৬ সালের জানুয়ারী মাস। আস্তে আস্তে নাটক ক্রমশ জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে, আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দেবশংকর হালদারের উপর, যে এখন সব্যসাচী। আর ক্রমশ অবাক হতে থাকি, একি নান্দীকারের সেই চুপচাপ, মুখচোরা দেবশংকর? যাকে আমরা জানতাম শুধুমাত্রই একজন ভাল অভিনেতা হিসেবে, সে এত আগুন কোথা থেকে পেল? এত শক্তি? আমি ভুলে গেলাম এ আমাদের দেবশংকর, ও এখন আমার কাছে সব্যসাচী, সব্যসাচী সেন, যে বহু বছর পর ফিরে এসে চারপাশের পরিবর্তনকে মানতে চাইছে না। অতীতের মূল্যবোধ তার কাছে স্পষ্ট, জীবন্ত। দেবশংকর অভিনয় করেনি এ নাটকে, এক অসাধারন জীবনীশক্তিকে সম্বল করে নিজের ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে পাড়ি দিয়েছে এক অসম্ভবের পথে।
দেবশংকর পাশে পেয়েছে রজতাভ দত্তকে, যে এই নাটকে ইন্দ্র, সব্যসাচীর ছেলে এবং প্রায় সমবয়সী। নাটকে দুটি স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হয় যখন দেবশংকর আর রজতাভ তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের খোলা তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয়। অসাধারণ দৃশ্য।
দেবশংকর আর রজতাভ আমায় দুবার কাঁদিয়েছে ওই দুই অসাধারণ দৃশ্যে। ইন্দ্রের চরিত্রের সত্য প্রকাশ পেয়েছে রজতাভের অভিনয়ে। সেদিনের অভিনয় দেখে একজন অভিনেত্রী হিসাবে আমার বারবারই মনে হচ্ছিল থিয়েটার কেন এখনও শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে বেঁচে থাকবে তার উত্তর আমি পেয়ে গেছি।
সব্যসাচীর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী চরিত্রে মায়া ঘোষ দারুন অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে ছাব্বিশ বছর পর সব্যসাচীর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার দৃশ্যে তিনি অনবদ্য। সব্যসাচীর দুই বন্ধু নকশালপন্থী রাজেন (শ্যামল চক্রবর্তী) আর পাল্টে যাওয়া সনৎ (রণজিৎ চক্রবর্তী) বড় জ্যান্ত তাদের স্বাভাবিক অভিনয়ে। কস্তুরী চ্যাটার্জির বীথি খুব ভাল। সব্যসাচীর মেয়ে ইন্দ্রানী (মৈত্রেয়ী দাস) নাটকের প্রথম দিকে যতটা ভাল, বিরতির পর ইন্টারভিউয়ের দৃশ্যে ততটা নয়। একজন অভিনেত্রী হিসাবে মৈত্রেয়ীকে বলতে পারি নাটকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের চরিত্রে সৎ থাকা যে কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবশ্য কর্তব্য, দর্শকের কথা মাথায় রেখে অভিনয় করলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইন্টারভিউয়ের দৃশ্যে টিভি অ্যাঙ্কর শ্রমণার চরিত্রে, কৌশিকী বিশ্বাস যথাযথ। পৃথিবী যে কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, অঙ্কের নিয়মে মানুষকে যে কিভাবে মাপা হয়, এই ইন্টারভিউয়ের দৃশ্য তা ক্রমশ অস্পষ্ট করে তোলে। পাল্টে যাওয়া সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার এই দৃশ্যেও দেবশংকর অসাধারণ।
নাট্যকার এই নাটকে স্তালিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং দৃশ্য রেখেছেন। স্তালিন চরিত্রে অসিত বসু ভালই অভিনয় করেছেন কিন্তু উঁচু প্লাটফর্মে তাকে খুব একটা স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল না।
এই নাটকের তরুন নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। বাংলা থিয়েটারে বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিশ্রমী কাজ করল দেবেশ।
শেষে আমার ভালবাসা জানাই ব্রাত্যকে। ছোট পর্দা যখন আমাদের সাংস্কৃতিক জগতকে গ্রাস করে ফেলেছে, থিয়েটার যখন প্রায় 'মাইনরিটি কালচার', তখন ব্রাত্য যে সাহস, সততা ও বিশ্বাস নিয়ে এই রাজনৈতিক নাটকটি লিখেছে, সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। দেবশংকর রজতাভ, ব্রাত্য, দেবেশ এবং সংসৃতির সবাই মিলে, যে পরিবর্তন থিয়েটারে নিয়ে এলো সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, আরেকবার। আমি সমস্ত পাঠককে অনুরোধ করব, এই নাটকটি দেখার জন্য।

পল্টু দাশগুপ্ত
কি করবো? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?

সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে নাটকটি দেখতে গেলে তো মনে হবেই এ নাটক সি.পি.এম.- এর বিপক্ষে। কিন্তু যারা সেই সাতের দশকের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এই রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, বা এখনও যাদের মধ্যে মূল্যবোধটুকু বেঁচে রয়েছে অথবা যারা এখনও আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠি না, তাদের কাছে এ নাটক নিজেকে ফিরে দেখা। জিজ্ঞেস করার কি ছিলাম? কি হয়েছি? জানালেন পল্টু দাশগুপ্ত। (নাট্যান্বেষী)

এক অন্ধকার এবং সংকটময় সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। সংকট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বত্র। আলো নেই কোথাও, অন্ধকারে থাকতে থাকতে আলোর খোঁজ নিতেই ভুলে যাচ্ছি। প্রধান দল, বিরোধী দল, উপদলগুলো নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে কেবল নিজেদের কথাই ভেবে চলেছে। যে স্বপ্ন, যে আদর্শ নিয়ে আমরা ছাত্র জীবনে রাজনীতি শুরু করেছিলাম, আজ তা ভেঙে খান খান। কি করবো আমরা? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? নিজেকে একবার ফিরে দেখবো না? দেখতে হয় না, নিজেদের মুখগুলো দেখিয়ে দেয় 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। আমরা, যারা বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা কোথায় ছিলাম? কোন আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতাম? আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? কতটা আদর্শহীনতা আমাদের সংগঠনকে, আমাদের মানসিকতাকে গিলে নিয়েছে—তা বেশ পরিষ্কার করে বলে দেয় সংসৃতির এই প্রযোজনা।
নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী সেন, সত্তর দশকের বিপ্লবী সব্যসাচী, সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছিলেন অথবা সেই সময়টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আজ ২০০২ সালে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন নিজেকে মেলাতে পারে না এই সময়ের সঙ্গে—তার পরিবার, তার রাজনৈতিক দল, তার সমাজ এবং তার পুত্রের জীবন দর্শনের সঙ্গে। তাকে কেন্দ্র করেই মঞ্চে অন্যান্য চরিত্ররা ভিড় করে। সব্যসাচীর সঙ্গে তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমার সামনে ধরা পড়ে সেই সময়ের বামপন্থি রাজনৈতিক আদর্শ এবং আজকের বামপন্থি রাজনৈতিক আদর্শের বিস্তর ফারাকটা। বা আরো পরিষ্কার করে বলি, সেই সময়ের আদর্শ এবং এই সময়ের আদর্শহীনতা।
নাটক দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ নাটক সি.পি.এম. বিরোধী। আমি বলি কখনোই তা নয়। এ সচেতন করে দেয় আত্মসমালোচনার জন্য। সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে নাটকটি দেখতে গেলে তো মনে হবেই এ নাটক সি.পি.এম.-এর বিপক্ষে। কিন্তু যারা সেই সাতের দশকের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এই রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, বা এখনও যাদের মধ্যে মূল্যবোধটুকু বেঁচে রয়েছে অথবা যারা এখনও আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠি না তাদের কাছে এ নাটক নিজেকে ফিরে দেখা। জিজ্ঞেস করার কি ছিলাম? কি হয়েছি?
আর তাই যখন নাটকে বিরতি হয় আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। সব্যসাচীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবি এখন যে সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেখানে আদর্শ বজায় রেখে কী ভাবে কাজ করবো?
এই যখন আমার অবস্থা, তখন নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু কিছু সংলাপে আমি চমকে উঠি। সব্যসাচী ও রাজেনের সংলাপ আমাকে চমকে দেয়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম সরাসরি মঞ্চে এনে নাটককার রাজেনের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন সে সময় ডি. ওয়াই. এফ. আই. সহ সম্পাদক বুদ্ধ ভট্টাচার্য যে প্রতিশ্রুতি বা যে আদর্শের কথা শুনিয়েছিলেন আজ ক্ষমতার অলিন্দে বন্দী মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতি এবং আদর্শ কিভাবে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলেন। আসলে নাটকে এতো একটা সংকেত মাত্র। পুরো পার্টি নেতৃত্বেই এখন এই ভাঙন। আসলে পার্টি কম্প্রোমাইজ করতে শিখে গেছে। তা ক্ষমতা এবং প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য। আর সেই জন্যই পার্টিতে এখন স্থান হয় না রাজেনের মত সৎ-আদর্শময় চরিত্রগুলির। যে সততা এবং আদর্শ নিয়ে পার্টি নেতৃত্বে একদিন চলতে শুরু করেছিল, সেই সততা আর আদর্শ পার্টি নেতৃত্ব নেই। কারণ পার্টি শিখে গেছে কি করে ক্ষমতায় থাকতে হয়, আর সেই জন্যই পার্টি নেতৃত্বে ভিড় বাড়ে সনৎ-এর মতো চরিত্রদের, যারা কেবল নিজেদের আখেরটা গুছিয়ে নেয়।
এ এক মহাসংকট। এই নাটক সেই সংকটগুলো কেবল চিহ্নিত করে দেয়। এ নাটক শেষে কোনো আলো দেখায় না, কোন সমাধান দেখায় না। আমার মনে হয়েছে এই আলো, এই সমাধান আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। যে আদর্শহীনতা, যে অন্ধকার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমাদেরই দোষে, যে দলীয় দুর্নীতি, উপদল এবং তাদের কোন্দল তৈরি হয়েছে আমাদের দোষে, তা কেবলমাত্র স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে দেয় সংসৃতির এই প্রযোজনা। এই সাহসটির বড় প্রয়োজন ছিল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যি কথাই সত্যি করে বলার প্রয়োজন ছিল ঠিক এই সময়েই। নাটককার ব্রাত্য, নির্দেশক দেবেশ, উইঙ্কল টুইঙ্কলের অভিনেতারা এবং সংসৃতির নেপথ্য কর্মীরা সেই সাহস দেখাতে পেরেছে। আর সেই জন্যেই মনে হয় এই অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো আসবেই। আগামী দিন সেই আলো নিয়ে আসবে।